Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-XI, Special Issue, June 2023, Page No.31-38
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

লোকভাষা ও লোকসংগীত: প্রসঙ্গ উৎপল দত্তের 'জয়বাংলা'ও 'ভুলি নাই প্রিয়া'

উমাপদ সৎপথী
রাজ্য সাহায্যপ্রাপ্ত কলেজ শিক্ষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচমুড়া মহাবিদ্যালয়, বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:
If we look at any literature especially drama, we can see that the influence of folk culture or folklore is more or less present at the root of its creation. So writers and palakars too could never completely ignore its influence, which was no exception in the palas created by Uppal Dutta. Although he composes his verses in a political context, the folk influence is evident in them. One of which appeared in his 'Bhuli Nai Priya' and 'Joy Bangla' turns. A comprehensive discussion of which is our goal.
Key Words: Folk Culture.

বাংলা নাট্যসাহিত্য ও যাত্রা জগতের এক অন্যতম প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিত্ব হলেন উৎপল দত্ত। যিনি মঞ্চোপযোগী নাটক ও যাত্রা রচনার মধ্য দিয়ে সমৃদ্ধতা দান করেছেন বাংলা সাহিত্যকে। তিনি একাধারে অভিনেতা-পরিচালক-শিক্ষক-অনুবাদক-প্রাবন্ধিক ও পালাকার। যিনি সর্বত্র সমানভাবে নিজেকে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচনাগুলির মৌলিকত্বের দিকে একটু দৃষ্টিপাত করলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, তিনি তাঁর রচনাগুলির মধ্যে নিখুঁতভাবে তুলে এনেছেন মানব মনের গভীর অন্ধকার দিকগুলিকে। লোকসমাজে নিজেকে বিশেষভাবে পরিচিত করেছিলেন খল চরিত্রের নিপুণ অভিনয়ের মধ্য দিয়ে। এ প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ না করে পারা যায় না, অন্ধকার না থাকলে যেমন আলোর কোনো মহিমা থাকে না, একইভাবে ভালোর কদরও তখনই বাড়ে যখন খারাপ সামনে এসে উপস্থিত হয়। তাই কোনো নাটক বা যাত্রায় অভিনয়কারী নায়ক তখনই বিশেষভাবে সফলতা লাভ করেন, যখন সেখানে খল তথা ভিলেন চরিত্র নিখুঁতভাবে তার অভিনয়কে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হন। আর বলা বাহুল্য, এরকমই এক ভিলেন চরিত্রের অভিনেতা হলেন উৎপল দত্ত। তিনি যেমন অভিনয় জগতের একজন যথার্থ ভিলেন চরিত্র; একইভাবে তাঁর রচিত নাটকেও খল চরিত্রগুলিকে অঙ্কণ করেছেন সুনিপুণভাবে। উৎপল দত্ত তাঁর রচনাগুলিতে মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রেক্ষাপটের ন্যায় গুরুগম্ভীর বিষয়কে বিশেষভাবে তুলে ধরার সাথে সাথে চরিত্রগুলিকেও আকর্ষণীয় করে তোলার উদ্দেশ্যে মানুষের মুখের ভাষা বা লোকভাষা এবং লোকসংস্কারকে সুন্দরভাবে স্থান দিয়েছেন। মঞ্চস্থ পালা তখনই সফলতা লাভ করে যখন দর্শক চরিত্রগুলির মধ্যে প্রবেশ করতে সক্ষম হন অর্থাৎ নাট্য চরিত্রগুলির সঙ্গে একাত্মতাবোধ করেন। যা দর্শকের মনে হর্ষ-বেদনার ন্যায় সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির জন্ম দেয় এবং ক্যাথারসীসের মধ্য দিয়ে তারা আনন্দ উপলব্ধি করে থাকেন। তবে দর্শক মনের অন্দরমহলে প্রবেশ করতে হলে তাদের মনের ভাব, আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে কথ্যভাষাকেও গ্রহণ করলে পথ আরও সুগম হয়। পালাকার উৎপল দত্তের নাটকগুলি মূলত রাজনৈতিক ও সামাজিক

শোষণ-বঞ্চনা ও প্রতিবাদী চেতনার আলোকে রচিত হলেও তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যে বিশেষভাবে স্থান করে দিয়েছেন লোকভাষা ও লোকসংস্কারগুলির।

পালাকার হিসেবে উৎপল দত্তের নাম যেমন স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে, একইভাবে যাত্রা জগতকেও তিনি মাঝেমাঝেই সমৃদ্ধ করে তুলেছেন নাটক থেকে সরে এসে। গঠন করেছেন যাত্রাদল। 'মিনার্ভা' পর্বে এসে তিনি প্রবেশ করেছেন যাত্রা জগতে। নিজে একজন জনপ্রিয় অভিনেতা হওয়ার কারণে জনসংযোগ বেশি থাকায় মঞ্চ সফল অভিনয়ের উপাদান সংগ্রহের ক্ষেত্রে তাঁর অনেকখানি সাহায্য হয়েছিল। তাই তাঁর রচনাগুলিতে বারেবারে উঠে এসেছে নিম্ন শ্রেণীর মানুষের মুখের ভাষা ও আচার-আচরণের নিখুঁত বিশ্লেষণ।

'জয়বাংলা' ও 'ভুলি নাই প্রিয়া' নাটকে পালাকার উৎপল দত্ত বারেবারেই এই লোকসংস্কারগুলিকে তুলে ধরেছেন চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে। আর এর আলোচনার আগে বলতেই হয় লোকসংস্কার গঠনের বিশেষ কয়েকটি তথ্য। নিজেদের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজকে একটি নির্দিষ্ট ছন্দ বা নিয়মের মধ্য দিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দ্যেশে মানুষ প্রণয়ন করে নানান প্রথা বা লোকাচারগুলির। উঠে এসেছে তাদের ঐতিহ্যগত বিশ্বাস যা পরবর্তী সময়ে পরিণত হয়েছে লোকবিশ্বাসে। লোকবিশ্বাস সম্পর্কে ড. মৃত্যুঞ্জয় গুঁই তাঁর 'প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন লোকবিশ্বাসের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য— "এ বিশ্বাস ব্যক্তিগত বিশ্বাস না হলেও অনেক সময় ব্যক্তিগত বিশ্বাস ও গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ কর্তৃক গৃহীত হয়ে লোক বিশ্বাসে রূপান্তরিত হতে পারে। ষষ্ঠত, লোকবিশ্বাস অতীতকালে উদ্ভূত হয়ে বর্তমানে টিকে আছে। লোকবিশ্বাস বর্তমানকালেও উদ্ভূত হতে পারে; তবে তা অন্যকোনো ঐতিহ্যানুগ বিশ্বাসের স্বগোত্রীয় হলেই লোকবিশ্বাস হিসাবে একালে গৃহীত হতে পারে।"[১]

উৎপল দত্তের পালাগুলিতে উঠে এসেছে রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, উঠে এসেছে দেশ প্রেম, ভাতৃপ্রেম, ভগ্নী প্রেম, উঠে এসেছে জাতিভেদ সমস্যাও। তবে তিনি তাঁর রচনাগুলিকে লোকসংস্কৃতির সরসতার মাধ্যমে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। তাঁর নাটক সমগ্রের অষ্টম খন্ডের মুখবন্ধে উল্লেখিত হয়েছে— "উৎপল দত্ত কখনও কোনো ব্যক্তি বা পরিবারের সমস্যার মধ্যে তাঁর সৃজনকে গণ্ডিবদ্ধ করেন না। তাদের ঘিরে যে সমাজের বৃত্ত-- সেই সমাজের আর্থ-রাজনৈতিক টানাপোড়েনে, তার সাংস্কৃতিক কিংবা ধর্মীয় আচার আচরনের টানাপোড়েনে-- নাট্য-চরিত্রদের সুখ দুঃখ, আনন্দ-বেদনার চলচ্ছবি উৎপল দত্তের পালা রচনা।"[২]

প্রখ্যাত পালাকার উৎপল দত্তের যাত্রাগুলিতে লোকসংগীতের প্রভাব আলোচনার পূর্বে বাংলার লোকসংগীতের ধারাগুলির বিষয়ে একটু আলোচনা করা যেতে পারে। প্রখ্যাত এক সংস্কৃতিবিদের একটি উক্তি উদ্ধার করা হলো সেখানে তিনি বলেছেন— "বাংলাদেশকে জানিতে হইলে গানের মধ্য দিয়া ইহাকে জানা যত সহজ, অন্য কোন বিষয়ের মধ্য দিয়াই তাহা তত সহজ নহে। প্রাচীনতম কাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিকতম কাল পর্যন্ত বাঙ্গালীর সাধনার শ্রেষ্ঠ সম্পদই তাহার সংগীত। বাঙ্গালীর ধ্যান, ধারণা, সামাজিক আচার আচরণ, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী জীবনের সুখ-দুঃখের অনুভূতি সবই সঙ্গীত সাধনায় যে বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইয়াছে তাহার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করিতে না পারিলে বাঙ্গালীর চরিত্র এবং তাহার জাতীয় বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক ধারণা করা যাইবে না।"[৩]

বাংলাদেশ প্রাচীনকাল থেকেই সঙ্গীত চর্চার প্রাণকেন্দ্র রূপে পরিচিত। নানা ঘরানার নৃত্য-গীত বাংলার মাটিতে সৃষ্টি হয়েছে। বাংলা ভাষার আদি নিদর্শন থেকে শুরু করে আধুনিকতম সাহিত্য রচনা লক্ষ করলে এই সঙ্গীতের প্রভাব দেখা যায়। বাংলা ভাষার সাহিত্যিকদের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে তারা সকলেই সাহিত্যের সঙ্গে গীতি সাহিত্যকেও পুষ্ট করেছেন। এর এক অন্যতম প্রধান কারণ হল সঙ্গীত সাধনা বাঙালির মজ্জাগত একটি বিষয়।

লোকসংগীতগুলির রচনাকাল বা রচনাকার সম্পর্কে সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। কারণ প্রাথমিকভাবে এগুলি লিখিত সাহিত্য নয়। মৌখিকভাবে গীত হতে হতে এগুলির এলাকাভিত্তিক বেশকিছু পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সেই মৌখিক গানগুলি লিখিত রূপ পেয়েছে। এই রচিত সঙ্গীতে ব্যক্তি বিষয়ের হৃদয়ানুভূতি শুধু ধরা পড়ে না ধরা পড়ে সমগ্র সমাজের অভিজ্ঞতা; প্রতিফলিত হয় তাদের বাস্তব জীবন চিত্র। তখন আর এটি ব্যক্তির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে প্রকাশ করে সমগ্র সমাজের একটি প্রতিচ্ছবি।

লোকসাহিত্যের অন্যান্য উপাদানগুলির তুলনায় সংগীতের জনপ্রিয়তা বেশি। কারণ এর মধ্যে পুঞ্জীভূত থাকে মানুষের আবেগ। এর প্রধান আকর্ষণের আর এক কারণ তার সুর। যে সুর মানবজাতিকে বারে বারে আকৃষ্ট করেছে। এখন অবসর সময় কাটানোর এবং আনন্দ লাভের উপকরণ সহজলভ্য হলেও বেশ কিছু সময় পূর্বে পর্যন্ত মানুষের জীবনে এই চাহিদা মেটাত লোকসংগীত। বাংলার প্রতিটি অনুষ্ঠানে যে লৌকিক ব্রত বা ধর্মীয় ব্রত পালিত হত সেখানে লোকগীতির একটা সুপ্রভাব আজও লক্ষিত হয়; যার বেশিরভাগই পালিত হয় বাড়ির মহিলাদের মাধ্যমে। তাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা গেছে সুর হয়তো একই থেকেছে, কিন্তু বদল ঘটেছে ভাষা ও আঙ্গিকের। তাই বলা যায় সুরকে তারা কখনোই বিকৃত করেননি। ভাদু, টুসু, আলকাপ, জারি, গম্ভীরা, ভাওয়াইয়া, ভাটিয়ালি, মুর্শিদি প্রতিটি গানেরই আলাদা আলাদা সুর নির্দিষ্ট আছে। কিন্তু বিষয়ের মধ্যে সাযুজ্য বর্তমান। আর সবকটি লোকগীতির মধ্যে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষের জীবনের ছবি ধরা পড়লেও গায়করা কখনোই তাদের সুরের মিশ্রণ ঘটাননি।

মননশীল নাট্যকার উৎপল দত্ত তাঁর নাটকের আঙ্গিকে বেশ সুদৃঢ়ভাবে ব্যবহার করেছেন লোকগানগুলিকে। চরিত্র অনুসারে, পরিবেশগত সাযুজ্য রেখে নির্বাচন করেছেন গানগুলির। তাই তাঁর নির্বাচিত যাত্রাগুলিতে লোকসংগীতের ব্যবহারের দিকগুলি এই অধ্যায়ের আলোচ্য বিষয়।

বাংলার লোকসংস্কৃতির অন্যতম ধারক ও বাহক হল বাউল গান। বাংলার মানবমনে সুখ-দুঃখ এবং অন্তরের কথা এই বাউল গানের মধ্য দিয়ে বারে বারে উন্মোচিত হয়েছে। পালাকার উৎপল দত্ত তাঁর 'ভুলি নাই প্রিয়া' পালার সূচনাতে বাউলের গান চলে যাওয়ার মধ্য দিয়ে যাত্রাটিতে প্রবেশ করেছেন। যার মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে সমসাময়িক সমাজের চিত্র, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও জাতিভেদের কঠোর পরিণাম। তাঁর এই গানের মধ্য দিয়ে এর বহিঃপ্রকাশ লক্ষিত হয়—

> "নীরব নিশীথ রাতে কে ওই গাইছে গান
> গাইছে বাংলার গান সমীরণে মেশে তান
> বাংলা মায়ের দুই ছেলে হিন্দু মুসলমান
> বিষাদে ভরা আজ বাংলা মায়ের গান
> মায়ের কোলে দুই সন্তান

কেড়ে নেয় প্রাণ
মন্দিরে নেই ঘণ্টাধ্বনি, মসজিদে নেই আজান।"[৪]

সম্পূর্ণ পালাটিতেই লৌকিক উপাদানের অন্যতম উপাদান লোকগীতির ব্যবহার লক্ষ করা যায়। গানগুলির মধ্যে কোনো স্থানে সামাজিক সমস্যা, কোনো স্থানে রোমান্টিকতা, কোনো স্থানে রঙ্গ রসিকতাকে তুলে ধরতে এই ধরনের লোক উপাদানের ব্যবহার করেছেন বারে বারে।

তার 'জয় বাংলা' পালাতে স্থানে স্থানে লক্ষ করা যায় লোকজ উপাদানের ব্যবহার। এই পালাটি তিনি প্রথম অভিনয় করেন ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে, লোক নাট্য অপেরা রবীন্দ্রসদনে। এই পালাতে নারীগণের মুখে যে গান গীত হয়েছে তা পুর নারীদের গাওয়া গানের সদৃশ—

"চাঁপাবরণ রং রে কইন্যা পদ্মকলির মুখ।
ওই মুখেতে আছে কইন্যা ভাঙ্গা বুকের দুখ।।
কইন্যা আমার আঁখি তুইল্যা আড়ে ঠাড়ে চায়।
ঝড়বাদলে দেইখ্যা কইন্যা ভয়েতে চমকায়।।
কইন্যা আমার ভাতের লাইগ্যা বুক কুরিয়া মরে।
রসের যৌবন নিল ঝাপটায় আষাঢ়িয়া ঝড়ে।।"[৫]

খালিফের মুখে শোনা যায়-

"দুখের কথা বলব কত
আমার দুঃখ শত শত
দিবানিশি খাটি তবু
তেল আনিতে নুন ফুরায়।।"[৬]

পালাকার উৎপল দত্ত তাঁর রচিত যাত্রা এবং অভিনয়কে সফল করে তুলতে; দর্শকদের কাছে সেগুলির জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে প্রতিটি চরিত্রকে অঙ্কন করেছেন অত্যন্ত যত্নের সাথে মানব মনের উপযোগী করে। তাই ব্যবহারও করেছেন তাদের নিজস্ব ভাষা, গান, প্রবাদ ও সংস্কারকে। যার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে সমসাময়িক সমাজে বসবাসকারী মানুষের মানসিকতা। তার সাথে তুলে ধরেছেন সমাজের অভাব-অনটন, শোষণ-বঞ্চনার কথাগুলিকেও। যেগুলির উল্লেখ লক্ষ করা যায় তাঁর রচিত যাত্রাপালার গানগুলির মধ্যে—

"ডাল পিঁয়াজের পাঁচসিকা সের
গিন্নি করে গোসা।
মাছ কিনিতি পাইছি ভাইরে
চিংড়িমাছের খোসা।"[৭]

এই সংগীতের মধ্য দিয়ে উৎপল দত্ত তুলে এনেছেন বাংলার লোকসংগীতকে। একইভাবে শিশু ভোলানোর জন্য যেসকল ছড়া জাতীয় গান বাড়ির বয়স্করা গাইতেন, সেই ধরনের গানের ব্যবহারও এই নাটকে লক্ষ করা যায় গুলরুখের একটি গানে—

"আসে সন্ধ্যা দেখি সব নাচে ফুলচয়
হাসে কলি গায় পাখি
সোনার বরণ মাখি
হেলে দুলে গান গেয়ে বহিছে মলয়।"[৮]

এইভাবে যাত্রার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লোকজ উপাদান ব্যবহৃত হয়েছে। যা যাত্রাগুলিকে আরো উৎকর্ষতা দান করার পাশাপাশি সমকালীন মানুষের অভাব-অনটনের কথাকেও নিপুণভাবে এই গানগুলোর মাধ্যমে প্রকাশ করেছে।

সুতরাং এর থেকে সহজেই অনুমেয় যে, তাঁর রচিত নাটক এবং পালাগুলিতে তিনি লোকভাষা, লৌকিক উপাদান, লোকপ্রবাদের মত বিষয়গুলিকে বারে বারে তুলে ধরেছেন। আর এই লোক উপাদানগুলি রচয়িতা ব্যবহার করেছেন নর-নারী উভয়েরই উপর। যার মাধ্যমে তিনি দর্শকদের অতি সহজেই আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন। তাই নিসন্দেহে বলা যায়, এই ধরনের উপাদানগুলি তাঁকে মঞ্চ সাফল্য দিতে সহযোগিতা করেছে।

'ভুলি নাই প্রিয়া' পালাটিকে লক্ষ করলে আমরা দেখব অতি সহজেই তিনি মানুষের মুখের ব্যবহৃত ভাষায় প্রবেশ করেছেন। তাঁর 'জয়বাংলা' পালাতেও এটি ব্যবহার করেছেন নিপুণভাবে। পিতা-পুত্রের সংলাপে একেবারে ঘরের অশালীন ভাষাকেও তিনি স্থান দিয়েছেন। যা পুরোপুরি লোকজ ভাষা, সাহিত্যের ভাষা নয়। দবিরুলের একটি মন্তব্যে তা স্পষ্ট হয়—

"দবিরুল: ... এই যে! শালা! কোথায় গিয়েছিলে, শালা?
ইকবাল: সম্পর্কবিরুদ্ধ কথাবার্তা! ছেলেকে শালা বলাটা কোন্ দেশের বিধান?"[৯]

এমনকি সকলে যখন সমবেত কণ্ঠে গান গেয়েছে সেখানেও আমরা লোকভাষা বা মানুষের কথ্য ভাষার ব্যবহার লক্ষ করেছি। যেমন দেশাল, সিন্দুর, গরমি, খুঁটি-দড়া, ছড়ি -এর মত নানান উদাহরণও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বিভিন্ন চরিত্রের মুখে প্রকাশ পেয়েছে, যা ক্রমাগত বৃদ্ধি করেছে পালার মর্যাদাকে।

একইভাবে তাঁর যাত্রাগুলিতে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত লৌকিক উপাদানের কথাও উল্লিখিত হয়েছে। ফুলের সাজি, পূজার উপকরণ ইত্যাদির ন্যায় লোকজ ও বস্তুর ব্যবহার তার পালা গুলিতে স্থান করে নিয়েছে। এইভাবে লোক উপাদানের সাথে তিনি লোকসংস্কৃতিকে তুলে এনেছেন। পাত্রী দেখতে আসার পরে মুসলিম সমাজে মেয়েরা যে ধরনের আনন্দ করে গান গায় তারও প্রভাব এখানে লক্ষ করা গেছে। 'জয়বাংলা' পালাতে মেয়েরা ওয়াহেদকে বসিয়ে গান ও নাচ করতে শুরু করে। যে গানের মধ্য দিয়ে সমকালীন মুসলমান সমাজের সংস্কৃতির পরিচয় আমাদের কাছে উপস্থাপিত হয়। এভাবে উক্ত রচনার সর্বত্রই লোকসংস্কৃতির প্রভাব বিদ্যমান।

আরো যে দিকটি না বললে লোকসংস্কৃতির একটি দিক অন্ধকারে থেকে যায় তা হল লোকপ্রবাদ। এই লোক প্রবাদেরও ব্যবহার তার নাটকে খুব কম হয়নি। প্রবাদ একটি মূল্যবান সম্পদ। যার আলোচনা শুধুমাত্র এই বাংলাতেই সীমাবদ্ধ নয়, বিদেশেও এটি বহু চর্চিত একটি বিষয়। বাংলা প্রবাদের চর্চা অথবা সংকলনে যেসকল বিদেশিদের নাম জড়িয়ে গেছে তাদের একজন হলেন Captain T. H. Lewin এবং অপরজন J. D. Anderson।

শুধুমাত্র সাহিত্যের নিদর্শন হিসাবে এই প্রবাদগুলিকে প্রাথমিকভাবে মেনে নেওয়া হয়নি। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেছে এদের সাহিত্যমূল্যও যথেষ্ট রয়েছে। সেখানে যেমন মনস্তত্ত্বের কথা উঠে এসেছে, একইভাবে উঠে এসেছে চাষী-কুলি-মেথর অর্থাৎ সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কথা। এছাড়া প্রবাদগুলির মধ্যে উপস্থাপিত হয়েছে লৌকিক ক্রিয়া-কলাপের দিকগুলিও। তবে বেশ কিছু প্রবাদ অশ্লীলতার দোষ থেকে একেবারে মুক্ত নয়। এছাড়া এমনকিছু কিছু প্রবাদ লক্ষিত হয় যার অর্থ স্থান অনুযায়ী পরিবর্তিত হয়েছে। অর্থাৎ একই প্রবাদের স্থান ভেদে ভিন্ন অর্থ পরিলক্ষিত হয়।

তাই পালাকার উৎপল দত্ত তাঁর পালাগুলিতে বেশকিছু প্রবাদ প্রবচন এর ব্যবহার করে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করেছেন। যথেচ্ছ হারে এর ব্যবহার না করলেও প্রয়োজনমতো ব্যবহার থেকে তিনি দূরে সরে থাকেননি। কারণ এই প্রবাদটির আকার যেমন ছোট একইভাবে অনেক বড় বক্তব্যকে সুন্দর ও মৌলিকতার সাহায্যে প্রকাশ করা ছিল সহজ। পালাকার তাঁর 'ভুলি নাই প্রিয়া' পালাতেও বেশকিছু স্থানে প্রবাদের ব্যবহার করেছেন। যার উল্লেখ মেলে ফারুকের উক্তিতে—
"ফারুক: তোমার তো বাপু বড্ড নোলা?"[১০]

এই 'বড্ড নোলা' শব্দটি বাংলা একটি প্রবাদ। তিনি কিছু কিছু সময়ে শব্দের পরিবর্তন করেও প্রবাদের ব্যবহার করেছেন যেমন রৌশনের গলায় 'ভালোবাসলাম ঘৃণিত শত্রুকে' ঠিক একইভাবে রৌশনের কথায় আরও শোনা যায় 'গোলাপকে যে নামেই ডাকো না কেন গন্ধ তার থাকবে সমান মধুর।' অনুরূপ রামের মুখেও শোনা যায় 'দুশ্চিন্তায়-নিদ্রায়', 'আদায়-কাঁচকলায়' ইত্যাদি। এমনকি তিনি দক্ষতার সহিত বেশ কিছু প্রবাদকে ভাগ করেও ব্যবহার করেছেন তাঁর নাটকে—

> "বসন্ত: সর্বনাশ! আলিরা আসছে।
> আনোয়ার: আমার পৌষ মাস, রেয়াৎ করিস না।"[১১]

এইভাবে তিনি 'কারো পৌষ মাস কারো সর্বনাশ' প্রবাদটি ব্যবহার করেছেন।

সমগ্র পালাটিতেই তিনি এভাবে প্রবাদগুলির ব্যবহার করেছেন অনাবিল ভাবে; যেগুলি পালার গতিকে করেছে ত্বরান্বিত। এছাড়া বেশকিছু সম্পর্ক এবং পরিস্থিতি উল্লেখ করতে তিনি নিপুণভাবে প্রবাদগুলিকে ব্যবহার করেছেন।

তাঁর 'জয়বাংলা' পালাতেও বেশকিছু প্রবাদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। মরিয়ম তার নিজের মেয়ের দুষ্টুমিকে বোঝাতে যে প্রবাদটি উল্লেখ করেছেন তা হল-- 'মেয়ে তো নয়, বোম্বেটে'। এছাড়া দবিরুলের উক্তি 'সময়ে ব্যাকরণ ধরে','বায়ু নাই, বাতাস নাই, আমার পালকির পর্দা উড়ে রে'। একইভাবে ইকবালের বক্তব্যে পাওয়া যায় ----

> "ইকবাল: কি, নাজু? এত কথা বলিস, সারাদিন ঘরের চালে কাকপক্ষী বসতে পায় না। এবার কি হল?
> এ্যাঁ? কথা কও! ওয়াহেদ সাহেব চাতকপক্ষীর মতন অপেক্ষা করে আছেন।"[১২]

এখানে 'চালে কাক বসতে না পারা' এবং 'চাতকপক্ষীর মতন অপেক্ষা করা' দুটি বহুল প্রচলিত প্রবাদের উদাহরণ। একইভাবে দবিরুল ব্যবহার করেছেন 'লটবহর'। বড় মিয়া ব্যবহার করেছেন 'পিতৃ পুরুষের ভিটা' এবং মাথা গোঁজার ঠাঁই' 'তেলে-জলে মিশ খায় না'-এর মত নানা প্রবাদ।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে উৎপল দত্ত তাঁর যাত্রাগুলি রচনা করলেও তার মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থেকে শুরু করে জাতি-ধর্ম ভেদের উল্লেখও করেছেন। তাঁর 'ভুলি নাই প্রিয়া' এবং 'জয়বাংলা' যাত্রাগুলিতেও এ ধরনের বিষয়বস্তুর সঙ্গে সাযুজ্য রেখে চরিত্রগুলির মধ্যে তিনি সফলভাবে লোকজ উপাদানগুলি ব্যবহার করেছেন। তাঁর প্রতিটি পালাতেই এই উপাদানের ব্যবহার সমকালীন পালাকারদের যেমন উদ্বুদ্ধ করেছিল, তেমনই সাহিত্যে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে। মানব মনে দানা বেঁধে থাকে অসংখ্য দুঃখ-কষ্ট-বেদনা, যা প্রতিটি মানুষকেই বেঁধে রাখে কঠিন সমস্যার মধ্যে। আর সকলেই চায় সেগুলিকে দূরে সরিয়ে রেখে সমাজ ও জীবনকে সুস্থ স্বাভাবিকভাবে অতিবাহিত করতে, সমাজের নানান প্রতিবন্ধকতা থেকে কিছুটা মুক্তি লাভ করতে। আর বলা বাহুল্য, এই পালাগুলির মধ্য দিয়ে তা সম্ভব।

তথ্যসূত্র:

১) গুঁই ড. মৃত্যুঞ্জয়; "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস"; সাহিত্য লোক, ৫৭ এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬; প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯২; পৃষ্ঠা ২১।
২) দত্ত উৎপল; নাটক সমগ্র অষ্টম খন্ড; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলকাতা৭০০০৭৩; মুখবন্ধ।
৩) চক্রবর্তী বরুণ কুমার; "বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস"; পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন; কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭; পৃষ্ঠা ২৯৩।
৪) দত্ত উৎপল; নাটক সমগ্র অষ্টম খন্ড; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলকাতা৭০০০৭৩; পৃষ্ঠা-৩।
৫) তদেব; পৃষ্ঠা ৭৯।
৬) তদেব; পৃষ্ঠা ৮০।
৭) তদেব; পৃষ্ঠা ৮০।
৮) তদেব; পৃষ্ঠা ১২।
৯) তদেব; পৃষ্ঠা ৭১।
১০) তদেব; পৃষ্ঠা ১৫।
১১) তদেব; পৃষ্ঠা ৩৬।
১২) তদেব; পৃষ্ঠা ৭৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

১) ড. মৃত্যুঞ্জয় গুঁই; "প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে লোকাচার ও লোকবিশ্বাস"; সাহিত্য লোক, ৫৭ এ কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলকাতা ৬; প্রথম প্রকাশঃ সেপ্টেম্বর ১৯৯২।
২) উৎপল দত্ত; নাটক সমগ্র অষ্টম খন্ড; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলকাতা ৭০০০৭৩।
৩) বরুণ কুমার চক্রবর্তী; "বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস"; পুস্তক বিপণি ২৭ বেনিয়াটোলা লেন; কলকাতা ৯, প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭।
৪) উৎপল দত্ত; নাটক সমগ্র নবম খন্ড; মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রা:লি:; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট; কলকাতা ৭০০০৭৩।
৫) পবিত্র সরকার; "নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ"; দে'জ পাবলিশিং; কলকাতা ৭০০০৭৩; প্রথম অখন্ড দেজ সংস্করণ: মার্চ ২০০৮।
৬) শিশিরকুমার দাশ; "কাব্যতত্ত্ব অ্যারিস্টটল"; প্যাপিরাস; গণেন্দ্র মিত্র লেন কলকাতা ৭০০০০৪; প্রথম প্রকাশ ১৯৭৭।